প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

# ছোটগল্পে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে-প্রেক্ষাপট

## দীপন দাস
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

**Abstract**

*After the starting of Second World War, social condition was gradually become very difficult. People's life comes into great difficulty. They have to face various dangerous social riots. These riots create very bad affect in common people's life. The condition of peoples and society at that time, were immaculately draw by the Bengali litterateur like, Achintya kumar Sengupta, Manik Bandopadhyay, Tarashankar Bandopadhyay, Bibhuti Bhushan Mukhopadhyay ect. From this background, I discussed some selected short stories of above mentioned writers, which were written in fifty's decade. I want to analyses the trouble of people and society which they have to face at that time.*

সময়ের ধারা বেয়ে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প পাঠক মনে স্থান করে নিয়েছে আজ। মননের ক্ষুধা নিবৃতিতে - ছোটগল্পকেই বেছে নিয়েছে পাঠক। বাংলা ছোটগল্পে ১৯৪৬-এর বহুমাত্রিক রূপ-রূপান্তর পাঠকমনে আজো দগ্ধতার ভয়াবহতাকে তরতাজা করে রেখেছে। স্মৃতিপটে বিস্মৃত আলোকে লেখকরা কলম ধরেছেন এবং গল্প রচনা করেছেন। তাই ১৯৪৬-এর অদেখা চালচিত্রের শতচ্ছিন্ন প্রবাহ আমরা লেখকদের রচনা থেকেই পেয়ে যাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতছাড়ো আন্দোলন, কৃষক প্রজাদের অধিকারের লড়াই, মন্বন্তর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে স্বাধীন ভারতের দাবি একটা সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে। তবে ইতিপূর্বের মন্বন্তর এবং সংকটময় পরিস্থিতি জনজীবনকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। কে হিন্দু - কে মুসলিম তেমন গুরুত্ব পায়নি; সমস্যাটা ছিল প্রধান। ৩০-এর দশকের শেষ দিকে বিপ্লববাদের জোয়ারে হিন্দু মুসলিম সকলেই যোগ দিয়েছিল। কৃষক প্রজাদের অধিকার রক্ষার লড়াই, হিন্দু-মুসলমানের একত্রিত হওয়ার ফলে সেদিন মরাগাঙে ভরা জোয়ার এনেছিল। কিন্তু এই ভোল রাতারাতি পালটে যায়, দাঙ্গার প্রভাবে সম্পর্কে অবনতি ঘটে।

ঐক্যবদ্ধ অতীতের ঘটনা প্রবাহে আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ। দেখেছি স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ জনজাগরণ। তবে ১৯০৫-এর বঙ্গ বিভাগ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য শক্তিকে তেমনভাবে প্রভাবিত করেনি। কিন্তু লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের মতানৈক্য দেখা দিল (চৌদ্দ দফা দাবি) সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূত্রপাত ঘটে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মতামত পালটায়। এরই প্রস্তুতি চলতে থাকে গ্রামে-গঞ্জে। ১৯৪১-এর দাঙ্গা ছিল তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে 'ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব' ৪৬ এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এছাড়াও জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক, লীগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছিল। হিন্দুরাও বিভিন্ন ('হিন্দু সেবক সংঘ') সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। আত্মঘাতী এই সময় পর্বে বাঙালি মুসলমান কেউ পিছিয়ে ছিলনা। মুসলমানদের কণ্ঠে যেমন শোনা গেছে 'আল্লা হো আকবর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' আবার বিপরীতে ধ্বনিত হয় - 'নেহী দেঙ্গে পাকিস্তান'।

সর্বপ্রথম ৪৬-এর এই ছবি আমরা মানিকতলায় দেখতে পাই। এরপর বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, রাজাবাজার, শিয়ালদহ, মির্জাপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় স্বদেশবাসী সংঘর্ষেলিপ্ত হওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শক্তির। সেদিন তারা নিশ্চুপ দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। মাত্র চার-চারটি দিনের লড়াইয়ে কলকাতা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। কলকাতার পর নোয়াখালির চেহারাটা ছিল হৃদয় কাঁপানো। 'অন্তত ৭৫,০০০ থেকে ১০০০০০ মেয়েদের পড়তে হয়েছে লুটেরাদের হাতে। এরা লুট করেছিল মেয়েদের সম্পদ ও শরীর। রেনু চক্রবর্তীও 'ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা' বইটিতে এই ভবাবহতার কথা স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধীও সেদিন বলেছিলেন "Never in my

life has the path been so uncertain and so dim before me"। সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ এও বলেছিলেন - "আমি যদি ব্যর্থ হই ঈশ্বর যেন আমাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন"। 'সার্চ লাইট' এবং 'দি ইন্ডিয়ান নেশন' এসব পত্রিকাতেও পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার চিত্র কম বেশি বর্ণিত হয়েছে। ১৩৫৩-র বঙ্গশ্রী পত্রিকাতেও রয়েছে তারই দৃষ্টান্ত।

বাংলা ছোটগুল্পে দাঙ্গার চেহারা কেমন ছিল তা গল্পকারেরা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে। তবে দাঙ্গা কবলিত মানুষের লড়াই সংগ্রামের কথাথাকলেও সমাধান তথা শেষ কথা তাঁরা কেউ বলতে চাননি। সেই সময়ের সমাজ সভ্যতার ছবি, অবক্ষয়ের বর্ণনা কতটা, কিভাবে লেখকদের কলমে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রকৃত সেদিনের আবহ কেমন ছিল দাঙ্গার প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্মরণে ও উপলব্ধিতে সময়ের ঘটনা স্রোতে, ফিকে হয়ে আসা মননের কাছে - এই সকল গল্পে দেখেছি মানুষের বেঁচে থাকার ইপ্সা ও লড়াকু মনোভাব। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মানুষ আশাহত হয়নি - চরম মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছে। এমনই কিছু গল্প ---

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - 'স্বাক্ষর (১৩৫৩), 'দাঙ্গা' (১৩৫২)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - 'খতিয়ান' (১৩৫৩)
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় - 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি' (১৩৫৩)
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় - 'কলিকাতার নোয়াখালি-বিহার' (১৩৫৪)
রমেশচন্দ্র সেন - 'সাদা ঘোড়া' (১৩৫৩)
সমরেশ বসু - 'আদাব' (১৯৫৩)

'স্বাক্ষর (১৩৫৩) গল্পে দুই বন্ধুর মধ্যে দাঙ্গার ভবাবহ চিত্র অংকন করেছেন। পেশাগত দিক থেকে তারা দুজনই ফেরিওয়ালা। দীননাথের বাড়ি যশোর আর জহুরালির বরিশালে। তারা জীবন জীবিকার সন্ধানে কলকাতা শহরে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে এক বস্তিতে। অর্থনৈতিক কারণে তারা উভয়েই চিন্তিত। দুমুঠো গ্রাসাচ্ছদনের চেষ্টায় ঘুমের মধ্যেও সেই স্বপ্ন দেখে। পরিবারের কাছে কি করে আরো বেশি অর্থ পাঠানো যায় সেই প্রচেষ্টাই তাদের মধ্যে। স্মৃতিতে ভেসে ওঠা চির সবুজ সেই গ্রামটিতে কবে তারা ফিরবে এই জিজ্ঞাসা।

"লক্ষীর মত পরিপাটি ধানখেত, গোপালের মত ঠান্ডা নদী আর প্রথম জোয়ারের কুলকুলের মত তাদের শিশুদের কলস্বর" অর্থাৎ বরিশাল -যশোরের গ্রাম্য প্রকৃতিতে ষড়যন্ত্রের প্রভাব তখনো পড়েনি। এমনকি রাঙা রক্তে পিচ্ছল হয়নি গৃহাঙ্গন। তাদের দুজনই নিত্য নতুন জিনিস ফেরি করে। এক সময় দীননাথ বরফ, কুলফি, আলতা, ফিতে, কাঁটা বিক্রি করে তো, জহুরালিও ডিম কখনো বা সব্জী বিক্রি করে। তারা দুই বন্ধু বিনে পয়সায় একে অপরের কাছে আদান প্রদান করে। টাকা-পয়সার কথা উঠতেই লঘু হাসি ও ঠাট্টা করে। জীবনের এক রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে গলির মোড়ে লড়াই দেখে এবং সেই রাস্তায় ব্যবধান ঘটে। তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লাঠি-সোটা ছুড়তে থাকে। অবিশ্বাসের অস্ত্র তাদের হাতে শানিত হয়ে ওঠে। একজনের হাতে ইট অপর জনের হাতে বোতল। ভয়াবহ সেই মুহূর্তে জহুরালি ও দীননাথেরভ মুখে ঘনীভূত হয়েছিল অন্ধকার। শহরের রাস্তায় দোকান পাঠে আগুন জ্বলতে থাকে। গৃহস্তের আঙিনা শিশুর রক্তে সিক্ত হয়ে ওঠে। এমনই এক সময় শহরে বুকে দুই বন্ধু সুখ-দুঃখের সাথীরা উন্মুত্ত লড়াইয়ে মেতে ওঠে। অথচ হিন্দু-মুসলিম দুই বন্ধুর আন্তরিকতায় অনুভবে শেষ পর্যন্ত শান্তির আশ্বাস ধ্বনি শোনা গেছে। বন্ধুত্বে উপর বিশ্বাস ভঙ্গ হয়নি। এমনই কিছু দৃষ্টান্ত যথাক্রমে ---

ক।। 'নে, এই দুটো ডিম নে। .....নে, ভেঙে ফ্যাল। দাম নিবি কত?
দীননাথ বললে .....। নে, বকবক করিস নে। সেদিন রাবড়ি -
বরফ খাইয়ে দাম নিয়ে ছিলি? দুই জন একসঙ্গে হেসে উঠল।।" (পৃঃ ৪৫৭)
খ।। দ্বিতীয় আরো একটি দৃষ্টান্তে জহুরালি গামছা কিনতে এলে দীননাথ বলে -
'নে, খুব ঘন বুনট' লাভ নেব না এক পয়সা তোর ঠেঙে। ঠিক কেনা-দরে বেচছি।' (পৃঃ ৪৫৮)

অবিভক্ত বঙ্গের দুই ফেরিওয়ালা নিজেদের হাড়ির খবর সবই জানে। তারা এও জানে দারিদ্রতার তো জাত ধর্ম থাকতে নেই অন্তত এদের দুজনের মধ্যে তা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু দাঙ্গা শুরু হতেই দুজনের মধ্যে এই আন্তরিকতা উধাও হয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে ক্ষিপ্ত হয়েছে। দাঙ্গার পরিবেশ থিতু হতেই দুই বন্ধু অগ্নিদগ্ধ পোড়া বাড়িতে অপরিচিতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। বাইরে সতর্ক চোখের প্রহরী, বুটের খট্ খট্ আওয়াজে সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছিল। অন্ধকারে প্রাণের ভয়ে তারা 'কুঁকড়ে আরও ঘন হয়ে বসল'। অথচ তারা কেউ ইচ্ছে করে আলাদা হতে চায়নি। পরিস্থিতির কাছে অসহায়ের মতই নিজেকে সমর্পণ করেছে। আবার কণ্ঠস্বরের পরিচিতিতে ক্রমশ তারা দু-জন দুজনকে চিনতে পারে। একে অপরের ক্ষতের প্রলেপ দেয় ---

'তোর চোট লেগেছে কোথায়?
- মাথায়, বুকে। তোর?
- আমারও।' (পৃঃ ৪৫৯)

তাই অবশেষে একই বিড়ির টানে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছে তারা। অন্ধকার থেকে সন্ধিপত্রে এই ঔজ্জ্বল্যতার প্রকাশ তাদেরকে অন্তরের কাছে অটুট বন্ধনে নিবিড়তর করেছে। যে স্বাক্ষর-চুক্তি তারা একই আগুনের শিখায় করল তা চিরকালের সন্ধিপত্র, যেন জীবনের অঙ্গীকার।

'দাঙ্গা' (১৩৫২) গল্পেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চড় দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে ধুলেশ্বর ও আদমপুরের মধ্যে লড়াইকে দেখিয়েছেন। তবে নর-নারীর প্রেম ভাবনায় সেই দাঙ্গা সফল হয়নি। দুটি গ্রামের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক বেঁধে দিয়েছেন দুটি চরিত্রের আত্মা মননের রূপকে ---

> "মমিনা আর জিন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর। দুজনে দেখা হোল মুখোমুখি।" (পৃঃ ৫১৭)

নড়বরে সাঁকোর উপর দিয়ে তারা দুজনেই নদী পারাপার করতে চায়। মমিনা জিন্নাতকে পথ্য ছেড়ে দিতে বললে জিন্নাত বলেছে 'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না হয় পানিতে দেব।" (পৃঃ ৫১৮)

মকবুলের মেয়ের সঙ্গে গফুরালির ছেলে জিন্নাতের আত্মিক টান প্রাথমিক পর্বে এভাবেই পেয়েছি।

কিন্তু চরদখলের লড়াইয়ে গফুরালি ও মকবুল তারা দুজনেই একে অপরের বিরুদ্ধশক্তি হয়ে ওঠে। তাদের এই লড়াইয়ে দুই পক্ষের জমিদার এসে দাঁড়ায়। আদমপুরের মোড়লের সঙ্গে ধুলেশ্বর গ্রামের মোড়লের এই লড়াই শেষ পর্যন্ত গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। তাদের কণ্ঠে শোনা যায় ---

> "কুছ পরোয়া নেই। মার পিট, খুনোখুনি, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হয়ে যাক হয়-নয়। ওসপার।" (পৃঃ ৫১৯)

একচিলতে জমির জন্য দ্বীপান্তরেও যেতে রাজি তারা। তবে জিন্নাত ধরা পড়তেই মকবুল নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। অথচ মমিনা সকলের চোখের অন্তরালে জিন্নাতকে মুক্ত করে দিয়েছ। জিন্নাতের ভাবনায় মমিনা শুধুমাত্র নারী নয়, সে যে আঁধার মনিক নদীর মত। "যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।"

অর্থাৎ জমি কেন্দ্রিক সমস্যা কি ভাবে দুটি গ্রামের মানুষকে দাঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিল তারই খন্ডচিত্র রয়েছে। তবে সমাধানের সূত্রটি নির্লিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়নি। মমিনা হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেও জিন্নাতকে পায়নি। জিন্নাত সেও ভালোবাসার কদর দেয়নি। প্রাণে বাঁচার আকাঙ্খা ও মুক্ত হওয়ার বাসনাই তার বেশি। তাই নদী পথেই পালিয়ে গেছে। 'একটা মেয়েকে বিয়ে করে। ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোট-জখম, এত রক্তপাত সব এমনি করে রফানিস্পত্তি হয়ে যাবে।' – এই ভাবনা মকবুল ভাবতে পারেনি। পিতার কাছে কোন মুখে সে দাঁড়াবে এই প্রশ্নই তাকে বিচলিত করেছে। তাই মনিমার প্রেমকে উপেক্ষা করে নারী ও নদীকে এক করে দেখেছে। তবে মনিমার প্রেমে ছিল গভীরত্ব। মকবুলের দেহের বাঁধন দেখে মনিমা বলছে – 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টে পৃষ্টে'। চর দখলের লড়াইয়ে মানুষ প্রাণ দিয়েছে, নিষ্পাপ প্রেমকেও দিয়েছে কবর। হৃদয়ের অন্তরালে প্রস্ফুটিত আত্ম আলোকে বুদ্ধির কাছে – আত্ম বিবেকের কাছে পরাস্ত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেভাবে চরিত্র দুটিকে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে-প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন – তাতে তাঁর শৈল্পীক অনুভূতি হয়েছে মুক্তোর মতো নিটোল-উজ্জ্বল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'খতিয়ান' গল্পে কারখানার দুই শ্রমিক চরিত্রকে দেখিয়েছেন। দাঙ্গার ভয়াবহতায় কিভাবেই বা বড়রাস্তার দুইপাশের বস্তিতে আগুন লাগে, কেমনভাবে জনতা উন্মত্ত হয়ে ওঠে রাঙা রক্তের নেশায়, সে ছবি আমরা পেয়েছি। আতোতায়ির হাত থেকে বাঁচতে বন্ধুর গৃহে তক্তপোশের তলায় মুখ বুজে শুয়ে থাকা; জান বাঁচাতে প্রাণের দায়ে সহ্য করতে হয়েছে গালি-গালাজ সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্ছনাকে। তেলচিটে পাথরের মতো বালিশ, ছেড়া মাদুর-চট, ঘরের আঁশটে সোঁদা উগ্র গন্ধ, আরশোলা, মশা, পোকার উৎপাত ও বিভৎস্য আওয়াজ, সহজে কি মানুষ মুখ বুজে সজ্য করতে পারে! অন্তত এমন নজির আমাদের জানা নেই। কিন্তু পরিস্থিতি-প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়। কেননা বাইরের প্রকৃতি এর থেকেও ভয়ানক ছিল। অসহায় মানুষের যন্ত্রণা-কাতরতা দাঙ্গার প্রেক্ষিতে এমনই সংকটজনক হয়েছিল। উদ্বিগ্ন মানুষ ভয়ে জড়সড় হয়ে কেঁচোর মত থেকেছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে আত্মমর্যাদাকে উপেক্ষা করে।

দুই বন্ধুর মধ্যে সময়ের অবক্ষয়ের সাথে সাথে আত্মবিশ্বাসে দেখা গেছে সংশয়। অথচ এরাই কাধে কাধ মিলিয়ে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম শ্রমিকের দল দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। অথচ –

> "দারুণ আক্রোশে হন্যে হয়ে যে দুটি দল চালিয়েছে হানাহানি খুনোখুনি লুটতরাজ আগুন দেওয়া। হৈ-চৈ হল্লার আওয়াজ এসে অবিরাম ভয়চকিত মনে হানা দিয়ে সচেতন করে রাখছে।।" (পৃঃ ১৭৯)

একসময় এরাই একত্রে শোভাযাত্রা-সভা, ধর্মঘট এমনকি পিকেটিং ও করেছিল। আজ তারা একে অপরের শত্রু হয়ে উঠেছে।

অভাব অনটন তথা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এই দুটি পরিবারকে সংকটের মুখে আরো আতঙ্কিত করেছে। বন্ধুর আগমনে রেশনের খোরাকিতে ভাগ বসিয়ে দেওয়ার বন্ধুর স্ত্রী কিন্তু মুখবুজে সহ্য করেনি। আবার আশ্রয় দিয়ে প্রতিবেশীর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে চায়নি। দয়া-মায়া-বোধ সবই পেটের খিদের কাছে উবে গেছে। তবুও অতিথিকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারেনি। মনের রাগে বঁধুটি ---

> "কোলের ছেলেটাকে মাটিতে আছড়ে বসিয়ে কাঁদায় ..... কান্নায় কান না দিয়ে চাপা গলাতে বলে, যত আপদ জোটে বাবা। ..... রেশন যা আছে ঘরে টেনেটুনে দুটো দিন নিজেদের মুখে দু'মুঠো গোঁজা। চলত তাদের, জোয়ান মদ্দ মুখ একটা বাড়ল।" (পৃঃ ১৭৯)

অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণেই শ্রমিকের বিদ্রোহ ও আন্দোলন। আন্দোলনের গতিমুখে সমাজ বৈচিত্রতার দৃষ্টান্তও লক্ষ করার মত। উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের অর্থনৈতিক ফারাক চিরকালের যা এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়। একদিকে দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলের কদাকার রূপ অপরদিকে সায়েবপাড়ার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অ্যাসফল্টের রাস্তা, রাশি রাশি শুচিতা, দুদিকে বাগান, প;ইয়ানোর মিষ্টি আওয়াজ, গেটের কাছে অস্ত্রধারী পোষাকপরা প্রহরী, নিঃসন্দেহে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যতাকেই দেখিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকের যন্ত্রণা ছিল আরো ভয়াবহ করুণতম। নিরাপদ আশ্রয়ে পথে নামতেই শ্রমিক মজুর দেখেছে রাশিকৃত ইট, ভাঙা বোতল, বাতাশে ভেসে আসা মাংস পোড়া গন্ধ। তাই আকাশের দিকে মুখ করে গ্রহ তারার অন্তরালে যিনি লুকিয়ে আছেন তার কাছেই জানতে চেয়েছে ---

'মড়াপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের?' (পৃঃ ১৮১)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুণ চিত্রকরের মতোই বলেছেন গরিবের কোন জাত নেই। কারণ দাঙ্গায় যারা মরেছে তাদের পরিচয় শেষ পর্যন্ত ভস্মীভূত ছাইস্তুপে পরিণত হয়েছে, অথবা সনাক্ত করা যায় না পুড়ে যায় লাশগুলি।

চিরকাল তো গরিবরাই প্রাণ দিয়ে গেল। ধনীর আত্মবলিদানের কাহিনি গল্পকারের লেখনীতে তেমনভাবে উল্লেখ্য নয়। তাই কারখানার গেটের কাছে জারি হওয়া ১৪৪ ধারা, বিধি ভঙ্গের কারণে শেষ পর্যন্ত দুজনকেই পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তখন মনের আক্রোশ নেভাতে বন্ধুর ছেড়া শার্টের কলার চেপে ধরে অস্ফুটে বলে - 'আজ শালা তোকে খুন করব'। কিন্তু বিপরীতে উত্তর এসেছে 'কর' নিরুপায়, আক্রোশহীন এমন কণ্ঠস্বর অনায়াসেই অন্যজনকে পরাহত করেছে। আর এরপরই চিরকালের সত্যকথন তাদের মুখে - গরিবের কোন জাত নেই। অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন ভাবেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে যে সমস্যাগুলো দেখাতে চাইলেন ---

ক) শ্রমিকের এক জোট হওয়া, প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা।

খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতির ঠিক পরেই ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিরূপে অখন্ড বঙ্গকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল - তার রূপচিত্রণ।

গ) মানুষের আত্ম বিবেকী মনের বহিঃপ্রকাশ, নাগরিক সভ্যতার চাটুত্বকে অপেক্ষাকৃত কৃতিমতায় ভরা জৌলুসে পরিপূর্ণতার রূপ।

ঘ) গল্পের বিষয় বর্ণনাতে বাস্তব-বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের প্রয়োগ করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'কলিকাতা দাঙ্গা ও আমি' (১৩৫৩)-র গল্পে দাঙ্গার ভয়াবহতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'মায়ের কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে ... নারীকে ধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্রে খন্ড খন্ড করে কাটা' - এমন চিত্রকে গল্পের প্রথমেই কথক নিয়ে এসেছেন। নিঃসন্দেহে এই স্মৃতি ভয়ানক। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে কিভাবে 'বিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যে সুন্দরবনের প্রেতলোকের আবির্ভাব হল' (পৃঃ - ১৪)। অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য কথক তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে 'কতিপয় স্বার্থন্বেষী রাজনীতিকের আপন সম্প্রদায় সমাজ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে আসন কায়েমী করার জন্য এটা একটা সামন্ততান্ত্রিক নীতি"। (পৃঃ - ১৪)

তবে কথক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে মনে করেছেন "বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি দলের শেষ মানুষটি যদি মরিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পথ দিয়া হিন্দুত্ব এবং ইসলাম পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিত"। (পৃঃ - ১৪) কিন্তু এই ভাবনার সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। মানুষের দুর্বিষহ এবং প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাই উত্তরত্তর বেড়ে গেছে - অভিশপ্ত হয়েছে মনুষ্যত্ব-মানবতা। কথকের মধ্যেও এই টানাপোড়েন। আত্মসমীক্ষণে তিনি নিজেকেই তুলনা করেছেন দাঙ্গা পীড়িতদের সঙ্গে। লজ্জা আর সংগ্রাম-সংঘর্ষহীন জীবন থেকে রেহাই পেতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের মধ্যেই মুখ ডুবিয়েছেন। কিন্তু নিজের চেনা জানা পরিচিতি মানুষ যখন বদলে ফেলে নিজেদের তখন তিনি নিজেও আত্মসুরক্ষার কথাটি না ভেবে পারেন না। কেননা গন্তব্যস্থানে পৌছে রাতের অন্ধকারে মুসলিম গাড়োয়ানের গরুর গাড়ীতে চেপে বসার পূর্বেই কুলির মুখে শোনা যায় 'মুসলমানের গাড়িতে যাবেন বাবু?' (পৃঃ - ১৮)

অর্থাৎ দাঙ্গার আগুন কলকাতা থেকে বহুদূর এই অঞ্চলেও ছড়িয়ে পরেছে। তবে দাঙ্গার বিধ্বংস রূপ গ্রাম্য মানুষ জনকেও চিন্তিত করেছে। কৃষি ও কৃষকের অর্থনৈতিক সুরক্ষা এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আঘাত জোড়ালো হয়নি। অসমর্থ গাড়োয়ানও নির্বিকার ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কিংবদন্তি অনুসারে অতীতের কথায় মানুষ বিশ্বাস রেখে ছিল। শোনা গেছে নারকীয় হত্যাকান্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা জাতিতে মুসলমান এবং ছদ্মবেশ ধরে তারা পথচারীদের হত্যা করত। 'নরহত্যার নায়ক ছিল মুসলমানেরা' ৯পৃঃ - ১৯)। তবে সামগ্রিকতার বিচারে লেখকের আত্মমনের যন্ত্রণা এবং হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই এক এই ভাবনাই গল্পটিকে চিরন্তন কালের করে দিয়েছে।

গল্পের অপর চরিত্র হাফিজ। লেখকের সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। অথচ দাঙ্গার দিনে আত্মরক্ষার জন্য তারা বাঙালি সাজ-পোষাক ব্যবহার করে। হাফিজের স্ত্রী 'সিঁথিতে সিঁদুর' এবং 'হাফিজের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি (পৃঃ - ১৫)। নিরাপদ স্থানে পৌছঁতেই বলেছে 'নামাজ সেরে নি ধীরে-সুস্থে খোদাতালাকে আল্লারসুলকে প্রাণ ভরে ডাকি। বড় বেঁচে এসেছি' (পৃঃ - ১৭)। হাফিজই শুধু নয় হাফিজের স্ত্রীকেও দেখা গেল 'মুখ এবং সর্বাঙ্গ এখন বোরখায় ঢাকা' (পৃঃ - ১৮)। ব্রাঞ্চ স্টেশনে এসে অন্য

একটি মুসলমান দলের সঙ্গে নির্দ্বিধায় রাত্রিযাপন করা হাফিজকে যেন পূর্বের দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরতা দিয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মতামতকে এই পরিনতির জন্য দায়ি করেছেন। বাউলের গানের ব্যবহারে তাঁর সেই অভিব্যক্তি লক্ষ করার মতই ---

"জ্ঞান-বুদ্ধির বড় লাইন গিয়েছে হেরে -
ভক্তিপথের ছোট গাড়ি হায়রে আগে দিয়েছে ছেড়ে।
আমার নিতাই চাঁদের ডেরাইবারির - কি কারিগরি -
মরি রে মরি। হায় তামাশায় হেসে যে মরি।" (পৃঃ ২০)

গান-বুদ্ধি লড়াইয়ে তো মানুষ নিজের কাছেই অসহায়-লীগের কার্যকলাপ, ভোটের মুখে মুসলমান সমাজের খিদমগার এমনই শুষ্ঠ নাগরিক সভ্যতাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল। আর সেই বিকলাঙ্গ সভ্যতার অবক্ষয়ের রূপটাই গল্পকার বর্ণনা করেছেন এবং সর্বনাশীদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

বিভুতিভূষন মুখ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা নোয়াখালি-বিহার' রচনায় কিভাবে ক্রমপর্যায়ে নোয়াখালি বিহারে দাঙ্গা ছড়িয়ে যায় তারই বর্ণনা দিয়েছেন। 'বিশ্বাস' গল্পের প্রেক্ষাপট কলকাতা শহর। ত্রিশ বছরের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে পাকিস্তান পরিকল্পনা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল দাঙ্গার আগুন। কিভাবে মানুষের বিশ্বাসে ফাঁটল ধরেছিল তারই বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। দুটি পরিবারের - দুটি বন্ধুর আদান প্রদান সম্পর্কের এই ছবি কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা নিম্নে তুলে ধরছি ---

ক) 'রহমানের আজি মা বোরখা পরিয়া ঐ পথে পরেশের বাসায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরেশের পিসির সঙ্গে রহমানের মায়ের সম্বন্ধ দাঁড়াইল ভাজের, বোরখা লইয়া ঠাট্টার স্রোত বহিল। পরেশের পিসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বোরখা না ঘোচাই শেষ পর্যন্ত তো আমায় তখন বোলো।"
রহমানের মাও এর উত্তর দিয়ে বলেছে -

খ) "তোমার মাথার কাপড় খুলে ধিঙ্গিপনা করে বেড়ানো বের না করি তো আমার নাম আমিনা নয়।" ... শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় একখানি কাপড়ের মধ্যে সেলাই করিয়া কি এক প্রস্থ উপহার দিলেন, দিব্যি দেওয়া রহিল শ্বশুরবাড়িতে গিয়া একেবারে সবার সামনে খুলিবে, তার আগে নয়। ..... মোড়কটা খুলিতে বাহির হইল একখানি শাড়ি, একটা ব্লাউজ, কিছু প্রসাধন দ্রব্য আর একখানি বোরখা - তাহাতে একটি ছোট কাগজ পিন্ করা আছে, লেখা আছে 'ধিঙ্গিপনার ওষুধ'।

কলকাতার অলিতে-গলিতে সেকালের দাঙ্গার রক্তঝড়া রূপের সঙ্গে ইতিহাসে স্মৃতিগন্ধি রক্ত-রূপকে যেভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন তার পশ্চাতেও রয়েছে একটা যুগবসানের কথা। সুতরাং যুদ্ধ, হানাহানি-কাটাকাটি, 'দেশভাঙো', মসজিদ ভাঙো, মন্দির ভাঙো, এই চিৎকারটা কিন্তু সেকালেরই প্রেক্ষিত প্রেক্ষাপট, মানুষের ভয়াবহ যন্ত্রণা কাতরতার চিত্রণই হয়েছে উল্লেখযোগ্য।

ভাঙাবাংলার রাজনোইতিক প্রেক্ষাপটে দুটি পরিবার, দুই বন্ধু দাঙ্গার দিনে একে অপরের প্রতি শতুভাবাপন্ন আচরণ করে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভেদনীতি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এতটাই চরমতম হয়ে ওঠে যে বাংলার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জন-মানসের কোলাহল চাপা পড়ে যায়।

কলকাতার বুকে বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার সংলগ্ন অঞ্চলের দাঙ্গা ঘটতে থাকে। স্লোগানে শোনা যায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আবার 'জয়হিন্দ! বন্দে মাতরম!' জেহাদের দিন ঘোষণা হতেই আকাশে-বাতাসে উত্তপ্ত ধ্বনি শোনা যায়। দেশের মন্ত্রীমন্ডলের গলাবাজি বেড়েছে, ব্রিটিশরা শুধুমাত্র শ্রোতা হয়েই থেকেছে। তারা হেসেছে ---

"..... বাঙালী হিন্দু, আজ তোমার জন্যই 'কুইট ইন্ডিয়া' দিয়া আমার আমার অভিনন্দন। যাচ্ছি, কিন্তু তোমায় শেষ না করে নড়ব ভেবেছ?"

পারস্পরিক সম্পর্কের ভাঙনের কেন্দ্রে এই অবিশ্বাস আরো তীব্র হয়েছে। ১৯৪২-এর যে নীতি, মন্ত্রীমন্ডলের ভাষণে, কিছু মানুষকে হঠাৎই একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল 'পাকিস্তানের কল্পনায়'। তাই রহমান সেই কল্পনাকেই সত্য ভেবে মিটিং মিছিলে যোগ দিয়েছে। দীর্ঘদিনের বন্ধুকে সাবধান করেছে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য। রাতের অন্ধকারেই প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করতে পারে নি বলেই কয়েকটি পরিবার চলে গেলেও পরেশ কিন্তু যায় নি। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখেও খেলার ছলেই রঙ লেগেছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। এই ভয়াবহ প্রবণতা সময়ের সঙ্গে আরো বেড়ে গেছে। আতঙ্কের একটাই শব্দ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ..... লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' (পৃঃ - ২৮০)। জন সমুদ্রের গর্জনেও শোনা গেছে "পাকিস্তান-মারো-জ্বালাও" (পৃঃ - ২৮০)। এই অগ্নিকান্ডে পরেশের স্ত্রী মেয়ে ছাই হয়ে গেছে। পাকিস্তান মন্ত্রীদের জেহাদ চরমে পৌঁছলে প্রতিহিংসার বিপরীত রূপও উঠে এসেছে। ধ্বংসলীলায়-বাঙালী, বিহারী, শিখ মিলিত ভাবে প্রত্যাঘাত চালালে 'জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ বিদীর্ন হয়ে উঠেছিল। রহমান শেষে নিজেকে, নিজের আত্ম যন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বলছে নেতাদের কথা, যারা মানুষকে চালিত করেছে বিভেদের রাজনীতিতে। পুত্র কন্যা-স্ত্রী কে দাঙ্গার মুখে পতিত দেখে সেও শিউড়ে উঠেছে। বিশ্বাসে ফাঁটল ধরতেই প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বলেছে ---

"কোথায় পাকিস্তান - ঐ দোজকের মধ্যে দিয়া তো দেখা যায় না ....." (পৃঃ ২৮৪)

সুতরাং পরিস্থিতি ঠান্ডা হতেই আত্মপোলব্ধির কাছেই মানুষ জিজ্ঞাসা করেছে এবং উত্তর পেতে চেয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটির প্রেক্ষাপট কলকাতা নয় নোয়াখালি। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসের কাহিনী এই গল্পে লক্ষ করার মত। তবে লেখক সচেতন থেকেছেন ---

> 'একটা মিনিস্ট্রি দুর্ভিক্ষ ঘটালে-অমন দুর্ভিক্ষ - সারা ভারতবর্ষে যার মতনটি এর আগে হয়নি। পরের মিনিস্ট্রির সেইটেই সামলানো উচিত তো? তা সে দাঙ্গাবাজি নিয়ে রইল।'

রাষ্ট্র শাসকরা বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়ে শেষ কামড়তা এভাবেই সেদিন দিয়েছিল। নোয়াখালির ঘটনায় হিন্দু-মুসলমানের উপর দোষারোপ না করে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবকেই জানা প্রয়োজন। গল্পের সূচনাতেও নোয়াখালির ধর্মকেন্দ্রীক সংঘাত, ঘর-বাড়ির পুড়ে যাওয়া ছাই, ভয় দেখিয়ে লীগের চাঁদা তোলা, একশ জনের পরিবারকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ভেঙেচুরে, তছনছ করে মাত্র দু-জনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সে দিকটাকেই চিহ্নিত করে দেয়। নাতিকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আক্রোশও সে কথারই জানান দেয়। শুধু হিন্দু নয় কথক প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণনা করেছেন ---

> 'ঘর সাত আট হিন্দু বাড়ি নিয়ে একটা ছোট্ট গ্রাম - একটা উঁচু জমির -ওপর, যেমন ওদিককার গ্রামগুলো হয়, তারপর বিঘে-দশেক একটা নিচু মাঠ, তার পরেই বড় একটা গ্রাম, মুসলমানদের বসতি। পুড়িয়েছে গ্রামটাকে। টাটকা ধ্বংস, তাজা রক্তের মতো আগুনে চাপ এখানে-ওখানে জমাট বেঁধে রয়েছে'

গা শিউরে ওঠার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এভাবেই। মুসলমান বলে পরিচিত মেয়েটি রিলিফ ক্যাম্পের লোকটির নজরে আসে। তাই পরের স্টেশনেই ট্রেনটি থামিয়ে তল্লাসি করলে জনৈক লোক দুটিকে দেখা যায়নি। মেয়েটিকে বোরখার অন্তরালে মুখের মধ্যে কাগজ ঠোসা, শক্ত কাপড় দিয়ে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মেয়েটি দেখেছে এগারোজনের পরিবারে নিজের চোখের সামনেই চারজনকে মরতে। মেয়েটি তাই জানায় ---

> "আমার সিঁদুর আমার কপালের সিঁদুর - আমার তো কোন দোষ নেই -আমার প্রাশ্চিত্তির করিয়ে আগে সিঁদুর দিন আমায় --" (পৃঃ ৯৩)

সেদিন গান্ধীজীও নিশ্চুপ থাকতে পারেন নি। তিনি অবশ্য প্রয়োজনহীনতাই অনুভব করেছিলেন। বুদ্ধিমতী মেয়েটি তাই চুল উঠে যাওয়া কপালে লেগে থাকা শেষ চিহ্নটুকু দেখিয়েছিল। বলেছিল 'কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল ওরা, কাফেরের ধর্মের জিনিস হাত দিয়ে ছুঁতে নেই কিনা।' (পৃঃ ২৯৩)

তাই পা দিয়েই সেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুলিশি তল্লাশির মুখে যারা মেয়েটিকে রেখে চলে গিয়েছিল রিলিফ ক্যাম্পে তারা পুনরায় ফিরে এসেছে। আর মৃত্যুর মুখে মেয়েটি বলেছে ---

"আমি মুসলমান-কিরন নয় - সামেদ"

তখন কথক বলেছেন এই পাপের হাত থেকে কে রক্ষা করবে। মানুষ প্রতিহংসায় এতটাই মেতে উঠেছিল যে ছদ্মরূপ নিয়ে রিলিফ ক্যাম্পের উপর আক্রমন হেনেছে, নারকীয় হত্যালীলায় মেতেছে।

কলকাতা নোয়াখালি থেকে বিহারে বিস্তৃত দাঙ্গার প্রভাব পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়েছে। চম্পারন লাগোয়া স্বরূপগড়ে নতুন সৃষ্ট চরটিতে দাঙ্গার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। এখানে রাজপুত, গোয়ালা এবং কিছু মুসলমান কে নিয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে শিশোধিয়ার সংখ্যাই বেশি। দোদন্ড প্রতাপ রঘুবীর সিং তার দলবল নিয়ে চম্পারন, অযোধ্যা, উত্তরে নেপাল ও চর শিশোধিতে মানুষের মনরাজ্যে কালজয়ী হয়ে উঠেছিল। সত্যাগ্রহের আন্দোলনে চম্পারনে গান্ধীজী এলে রঘুবীর সিং এর চারিত্রিক বিবর্তন ঘটে। সেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্মি হয়ে ওঠে ---

> আগাগোড়া মোটা খদ্দরপরা, তাতেও প্রয়োজনের এতটুকু বেশি নেই কোথাও শরীর অনেক ক্ষীণ ..... ছাপরায় সমস্ত জেলার তরফ থেকে তাঁকে একটা অভিনন্দন দেওয়ার জন্যে টেনে আনা হয়েছিল।" (পৃঃ ২৯৯)

কারণ বিয়াল্লিশের জনবিক্ষোভে তার বিশেষ অবদান ছিল। ত্রিশ বছর ধরে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু চারিপাশের ঘটনার একটু-আধটু আচ পৌঁছাতে থাকে চর শিশোধেতে। কলকাতা থেকে যারা পালিয়ে আসছিল তারাও সঙ্গে করে লুটের দ্রব্যাদি ঘরে তুলছিল। রঘুবীর সিং এই অঞ্চলে যাতে দাঙ্গা না হয় তার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করে গ্রামে গ্রামে প্রহরাতে লোক পাঠিয়েছেন। অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আর এই নিয়েই হাসানপুরের মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নরসিংহ পুরের গয়লারা সুঁতির ওপার থেকে লোক এনে গোকুলচরের মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবে এমন শোনা যায়। লোক পাঠিয়ে রঘুবীর সিং গোকুলপুরকে রক্ষা করে। কিন্তু হাসানপুরের মুসলমানের গৃহে হিন্দু নারীকে আটকে রাখার কথা শুনতেই রঘুবীর সিং নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই ঘোড়া ছুটিয়ে মহবুব মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হন। আশ্রিত মেয়েটিকে বাইরে বের করে আনার কথা বলতেই মহবুব মিয়ার ছেলে অস্বীকার করে। রঘুবীর হিন্দু হয়ে মুসলমানের জেনানায় ঢুকতে চাইলে 'কাফের' বলে মন্তব্য করতে মহবুব মিয়ার ছেলের মন্ডুচ্ছেদ করেন। চলতে থাকে ধ্বংসলীলা, হত্যা, অগ্নিকান্ড। হাসানপুর এভাবেই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। সত্যাগ্রহী আদর্শে বিশ্বাসী রঘুবীর সিং, কৃতকর্মের জন্য অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দেন, কণ্ঠে শুধু একটাই কথা ---

"আমার খদ্দর! আমার প্রতিজ্ঞা, আমার প্রায়শ্চিত্ত! (পৃঃ ৩০৯)

দাঙ্গার প্রভাবে গ্রামে-গ্রামান্তরে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়েছিল পারস্পরিক সম্পর্ক। শোনা গেছে গাজিপুর থেকে মহবুব মিয়ার বাড়িতে একটি মেয়ে এসেছিল। মেয়েটি বোবা। শেষে তাকে পাওয়া গেছে গলা কাটা অবস্থায়। তার অতৃপ্ত মনের একটা প্রচেষ্ঠার ছবি আঙুলের মাথায় লেগে থাকা সিঁদুরের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের শেষেও ধ্বংসের চরমতম রূপের কথা বলা হয়েছে ---

"হবেই, মেয়ের ওপর অত্যাচারে সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল। আমি কি করতে পারি? ..... (পৃঃ ৩০৯)

রঘুবীর সিং গল্পের এমন এক চরিত্র যে অতীতের পোশাক ছেড়ে বিবর্তিত হতে চেয়েছে। কিন্তু সর্বশেষে ধৈর্য, সংযম, ব্রত-আচারনিষ্টতা ক্ষণস্থায়ী বালির বাঁধের মতোই ভেঙে পড়েছে। এ কাজটা মহাত্মা গান্ধী করেছিলেন আমরণ অনশনের মধ্যে দিয়ে। এভাবেই ইতিহাসের প্রামান্য তথ্য আমাদেরকে নোয়াখালির পর বিহার, পাঞ্জাবে ঘটে যাওয়া দাঙ্গাকেই মনে করিয়ে দিয়েছে।

গল্পকার রমেশ চন্দ্র সেন 'সাদা ঘোড়া' গল্পে সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে সুনিশ্চিত করেছেন। চাঁদ নামের ঘোড়াটিকে নিয়ে হিন্দু পাড়ায় শুরু হয় নানান আলোচনা। ধবধবে সাদা রঙ দেখে কেউ কেউ অবশ্য স্বর্গের ঘোড়া বলেও মন্তব্য করে। কিন্তু অভুক্ত ঘোড়াটির কথা চিন্তা করে পাড়ার ছেলের দল পূজোর কথা ভুলেই যায়। ঘোড়াটির প্রতি সকলেই গভীর আন্তরিকতায় আদর যত্ন করতে থাকে। ছেলের দলের যমুনা প্রসাদ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে থাকে। এদিকে মালিকের অভাবে ঘোড়াটির শরীর ক্রমশই ক্ষীণ হতে থাকে। এমনই একদিন সকালবেলায় লুঙ্গী পরা ফেজটুপি মাথায় নতুন এক আগুন্তুকের আবির্ভাব ঘটে। ঘোড়াটিকে দেখতে পেয়ে লোকটা মুখে-চোখে আনন্দের তরঙ্গ দেখা যায়। এতদিন পর ঘোড়াটিও প্রথম মালিকের হাতে খাবার খায়। কিন্তু উন্মত্ত জনতা হঠাৎ যখন 'মার মার' চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসে তখন যমুনা প্রসাদ পাঁজা কোলে করে লোকটিকে হৃষিকেশ বাবুর বাড়িতে নিয়ে যায়। ঘন্টা খানেক পর সবকিছু শান্ত হলেও দেখা যায় রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে ঘোড়াটি গুলির আঘাতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

গল্পটিতে লেখক যে বিষয়গুলি দেখিয়েছেন ---

ক) দাঙ্গার ভয়াবহতা কাটিয়ে, অস্বস্থিকর পরিস্থিতি থেকে জনজীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনা।

খ) হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে বড় করে না দেখিয়ে মুসলমান বৃদ্ধ সহিসকে প্রাণে বাঁচানো।

গ) শান্তির বার্তাবহ সাদা ঘোড়া প্রতীকী তাৎপর্যতা বহন করে এনেছে। ঘোড়াটির মৃত্যুর মধ্যেও রয়েছে সেই ব্যাঞ্জনাময়তা –"সোরাব তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হীরক স্বচ্ছ আকাশের মতোই নির্মল দৃষ্টি। যে চাহনিতে কোন বেদনা নাই, গ্লানি নাই, হৃষিকেশও পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন।"

সমরেশ বসু তাঁর 'আদার' গল্পটিতেও ৪৬-এর দাঙ্গায় সূতাকলের শ্রমিক ও নৌকার মাঝিকে একই অন্ধকার গলির মধ্যে উপনীত করেছেন। দাঙ্গার দিনে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে আসতে দেখা যায় একটি লোককে; অপরদিকে গলির অন্ধকারে ডাস্টবিনের দুদিকে নির্জীবের মতো প্রতীক্ষা করেছে তারা। শুনতে পায় 'আল্লাহ আকবর' 'বন্দেমাতরম' এই ধ্বনি। অন্ধকারেই চারটি চোখ ভয় সন্দেহ নিয়ে স্থির থেকেছে। একটাই তাদের প্রশ্ন – হিন্দু না মুসলমান? ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে মুখে তাদের সেই প্রশ্নই। তাদের পরিচয়ে একজন সূতাকলের মজুর, বুড়িগঙ্গার অপরপারে সুবইদায় তার বাড়ি। অপরজনের নারায়নগঞ্জে। বিড়ির আগুন জ্বালাতে গিয়েই একজনের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় – সোহান আল্লা। অন্ধকারেই তারা অবিশ্বাসের কথা বলেছে। তবে উভয়ের কথোপকথনেই স্পষ্ট হয়েছে ইদের পরব উপলক্ষে মাঝি বউ ছেলে মেয়ের জন্য জামা-কাপড় কিনে বাড়ি ফিরছিল। আটদিন বাড়ি যায়নি সে। ছেলে-মেয়ের মুখ দেখেনি। এতটাই উদগ্রীব হয়েছে যে নৌকা না পেলেও বুড়িগঙ্গা সাঁতরেই পার হবে। সকলেই তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। মাঝির কথাতে সুতাকলের শ্রমিক আশ্বস্থ হলে তাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে কর্তব্য তাও বলেছে – সে যেন অন্ধকার থেকে এখনই বাইরে বেরিয়ে না আসে। অথচ ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে পরিবারের কথা ভেবেই মাঝি এগিয়ে গেছে। আন্তরিকতায়, একাত্মতায় মাঝির অনুভব অনুভূতির কদর করেছে শ্রমিক মজুর। এভাবেই তারা একভাবনায় – একই সম্পর্ক সূত্রের পরিচয় দিয়েছে। তারা উপলব্ধি করেছে – সমাজ সত্যতাকে – "ন্যাতারা হেই সাততলার উপর পা দিয়া হুকুম কইরা বইয়া রইল। আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।" চিরকালের সত্যকে সমরেশ বসু এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মিলিটারির হুঙ্কারে 'গুডুম-গুডুম' আওয়াজে সেই করুণ দৃশ্য ভেসে এসেছে সুতা কলের শ্রমিকের কাছে। তাই সুতা কলের শ্রমিক তাকে বাঁধা দিয়েছিল, মাঝির কামিজ চেপে ধরে বলেছিল – "কেমনে যাইবা তুমি, আঁ?" এভাবেই একে অপরকে নিরাপদে রেখে গেলেও মৃত্যুর মধ্যে মাঝির স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে।

সমরেশ বসু দাঙা, দেশ বিভাগের চিত্র, রাজনৈতিক মতাদর্শের অপ্রকাশিত রূপমাধূর্যকে চাক্ষুষ দেখেছেন। তিনি তাই 'আদাব' গল্পের মধ্যে দিয়ে চিরন্তন কালের সমস্যাকে দেখিয়েছেন। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটকে তিনি গল্প রচনায় প্রয়োগ করেছেন। ধর্ম বা বর্ণ নয় মানুষের মূল্য মানুষের কাছে এই বিশ্বাসই তার ছিল –প- আর সেকথাই তাঁর গল্পে বর্ণনা করেছেন।

দাঙ্গার প্রভাব থেকে আজো আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আজো এদেশের বুকে নারকীয় তান্ডব ঘটে চলেছে। কালে কালে অনেক কিছু বদলেছে বদলায়নি হিংসারাজত্ব। তবুও লেখকরা সমস্যার সমাধানে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। গল্প

আলোচনায় সেই বিষয়গুলি আজও পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে, পাঠক মনে প্রভাব ফেলে। আর এখানেই গল্পকাররা সার্থক। তাই শুধুমাত্র বিবরণ দিয়েছেন বা অক্ষমতাকে প্রকাশ করেছেন এমনটা বলা যাবে না। নিম্নে সেই সূত্রগুলি আলোকপাত করতে চাইছি যা পাঠককে এই সকল গল্পের কালজয়ী আবেদন বুঝতে সাহায্য করবে ---

ক) একই বিড়িতে দুজনের ভাগ —

"বিড়িটা নিবে গিয়েছিল। ধরালো জহুরালি। তিন আঙুলের মাথা একত্র বিড়িটাকে ঘুড়িয়ে ধরে শেষ টান দিল দীননাথ। আগুনের অক্ষরে এক সন্ধিপত্রে তারা স্বাক্ষর করলে।" ('স্বাক্ষর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

খ) প্রেমের কাছে পরাজিত হয়েছে হিংসার উন্মত্ততা। ('দাঙ্গা' - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

গ) 'বলশালা তোর কোনও জাত নেই, আমার কোন জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব, আমরা গরিবের জাত'। ('খতিয়ান' - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঘ) হিন্দু-মুসলমান নয় একজন পিতা, না পারার যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছে দাঙ্গার আগুন থেকে বন্ধুর মেয়েকে প্রাণে বাঁচিয়ে। ('বিশ্বাস' - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঙ) সত্যাগ্রহীতে আত্মঅনুশোচনায় রঘুবীর সিং এর অগ্নিকূন্ডে আত্মাহুতি দেওয়া নিঃসন্দেহে আত্মবিবেককে জাগরিত করে। ('সত্যাগ্রহী' -- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

চ) মানুষের পরিচয় 'জাতি' গত ধর্মের মধ্যে কখনো মেলে না। ('সাদা ঘোড়া' - রমেশচন্দ্র সেন)

ছ) 'মানুষ না আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি'। ('আদাব' - সমরেশ বসু)

এই সকল উক্তি-প্রত্যুক্তিতেই পরিস্ফূট লেখকদের প্রতিবাদী সত্তা। অর্থাৎ লেখকরা সমস্যার গভীরে মানবতার কদর্য পরিণতিকে যে রূপে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাদের নিরব প্রতিবাদ। আত্ম যন্ত্রণার গভীরে আত্মবিবেককেই তারা জাগরিত করেছেন। তাই দাঙ্গার প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে এই সকল গল্প আজও একই ভাবে আমাদের মননকে ছুঁয়ে যায়। ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে, সর্ব ধর্মের বাসস্থান যেখানে সেখানে এই সমস্যা থাকবে ততদিন এই সকল গল্পের প্রয়োজন হবে।

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, *ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, র‍্যাডিক্যল ইম্প্রেশন, কলকাতা - ৭০০০০৯।

২। রায় শান্তিময়, *গণদর্পন* (পত্রিকা), আগস্ট, ১৯৮৯।

৩। চট্টোপাধ্যায় সুদীন, *দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা - ৭০০০০৬।

৪। সেনগুপ্ত অচিন্ত্য কুমার, *একশ এক গল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা - ৭০০০১৭।

***